# রাগ-রাগিণীর দিনগুলি

১৯৪২ সালে আমি যখন কাকার সাথে প্রথম বম্বে যাই ,তখন কাকার সংগীত পরিচালনার দ্বিতীয় সহকারী হিসেবে নিজেকে খুব জাহির করলেও বা মাসান্তে কাজের বিনিময়ে বেতন নিলেও বাস্তবিক প্রফেশনাল মিউজিসিয়ান বলতে যা বোঝায় তেমনটা তখনো আমি হইনি এবং তেমনটা হওয়ার ইচ্ছা আমার নিজের যেমন ছিল না , তেমনি বাবুকাকাও সেটা চাননি। বাড়ী থেকেও কোনদিন কেউ আমাকে বলেনি যে , তুমি জওয়ান হয়ে গেছ। অতএব রোজগার করে বাড়ীতে সাহায্য কর। আমার চাকরি করাটা ছিল একটা নিমিত্ত মাত্র। আসলে কাকা চাইতেন যে তার সাথে থেকে থেকে আমি যেন প্রফেশনাল গানবাজনার আলো আঁধারির বিভিন্ন দিকগুলো সম্পর্কে হাতে কলমে ওয়াকিবহাল হই , বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা এত এত সুরকার, গায়ক-গায়িকাদের কাজের বৈশিষ্ট্য দেখে দেখে প্রফেশনাল গায়ক হওয়ার জন্য নিজেকে সেভাবে তৈরী করি এবং সর্ব্বোপরি গান-বাজনা শেখার ব্যাপারটায় সেই অর্থে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারি। যে কারণেই বম্বে পৌঁছানোর কয়েকদিনের মধ্যেই উনি প্রথম আমাকে নিয়ে যান সর্ব্বজন প্রণম্য ওস্তাদ অমন আলি খাঁ সাহেবের কাছে। খাঁ সাহেবের বয়স তখন প্রায় ৭০ ছুঁই ছুঁই। থাকতেন পারেল এ। কাকা আমাকে তার কাছে নিয়ে গিয়ে বল্লেন ,- " ওস্তাদজী ,ইয়ে মেরে ভতিজা মান্না। মুঝসে জিতনা হো সকা, তালিম হাসিল কিয়া। আগে কৃপয়া আপ অগর ইনকো জরা রাহ্ দিখানে কা মেহেরবানী করেঁ তো ইয়ে বচ্চা আপকা বহুৎ আধারি হোগা। " কাকার কথা শুনে বুড়োতো একেবারে রেগেই অস্থির। বল্লে - " নেহি নেহি , ম্যায় ইসকো কিঁউ সিখাঁউ ! ইয়ে বাচ্চা মুঝসে ক্যায়া শিখেঙ্গে !" আমাদেরকে কোন পাত্তাই দিতে চাইলেন না। একেবারে পত্রপাঠ বিদায় আর কি ! আসলে ক্লাসিক্যাল সিঙ্গার হিসেবে কলকাতায় কাকার যতই নাম-টাম থাকুক না কেন , অমন আলি খাঁ'র মতো ওস্তাদরা কৃষ্ণচন্দ্রদের মতো কলকাত্তাইয়া মার্গ সংগীতের শিল্পীদেরকে আদৌ গুণতির মধ্যেই ধরতেন না। আমার যতটুকু মনে হয় তখনও উনি বোধ হয় কাকার নামই শোনেননি। অথবা শুনলেও বড়জোড় এটুকুই শুনেছিলেন যে এই হচ্ছে

কলকাতা থেকে আগত অন্ধ প্লে- ব্যাক সিঙ্গার কৃষ্ণচন্দ্র দে , যিনি " বাবা মনকে আঁখে খোল " ' যাও যাও মেরে সাধো রহ গুরুকে সঙ্গ " ইত্যাদি জনপ্রিয় চিত্রগীতিগুলো গেয়েছেন। কাকার পরিচিতি তাঁর কাছে এর চেয়ে বেশী কিছু ছিল বলে আমার অন্তত মনে হয়নি। মানে কাকা যে এত বছর ধরে বাদল খাঁ , দবীর খাঁ , জমীরুদ্দিন খাঁ সাহেবদের মতো গুণী ওস্তাদদের কাছে একেবারে নাড়া বেঁধে শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম পেয়েছেন এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে উনি যে একজন নামকরা শাস্ত্রীয় সংগীত গাইয়ে , ওদের কাছে অর্থাৎ অমন আলি খাঁ সাহেবদের মতো মুসলমান ওস্তাদদের কাছে সেসব কথার কোন গুরুত্বই ছিল না। শুধু কাকাই নয়, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী প্রমুখ যে সমস্ত শাস্ত্রীয় সংগীত গায়কদের নিয়ে কলকাতায় খুবই মাতামাতি হত , তাদের সম্পর্কেও দেখেছি ঐসব ওস্তাদরা তেমন কোন খোঁজ খবরই রাখতেন না। ঐরকম যখন অবস্থা , মানে স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র দেকেই যখন ধর্তব্যের মধ্যে আনছেন না , তখন তাঁর তালিম প্রাপ্ত ভাইপোকে যে কী নীচু নজরে দেখবেন, সেটাতো সহজেই অনুমেয়। তবু কাকা আবারও বল্লেন,- ' ওস্তাদজী , আপ মান্না কো একবার সুনকে তো জরা দেখিয়ে। শায়েদ ....." । কি মনে হ'ল ওনার কে জানে , বল্লেন ,- "জরা গাকে তো সুনাও। " আমি দেখলাম এই সুযোগ। এই সুযোগ হাত ছাড়া হলে ওনার কাছে আমার আর গান শেখা হবে না। তানপুরাটা পাশেই ছিল, নিয়ে চোখ-কান বুঁজে গেয়েদিলাম কাকার কাছেই শেখা ইমনেরই কি যেন একটা বন্দেজ। গান সম্পর্কে ভালো-মন্দ কোন মন্তব্য না করে হঠাৎ বেশ মেজাজি চালেই বল্লেন - " জানতে হো ইমন কিতনে প্রকার কে হোতে হ্যাঁয় ? ' চার প্রকারকে। ঠিক হ্যায় , কালসে তুম রোজ ঠিক রাত কো ন'বাজে হামারে পাস আয়া করো।" আমি বল্লাম যে , ওস্তাদজী এত রাতে আপনার কাছে গান শিখতে আসবো, অন্য কোন সময় এলে হয় না ? ওটাতো খাওয়া দাওয়া করার সময়। " উনি বল্লেন - " ঠিক হ্যায়,যাও তুম যাকে খানা খাতে রহো , ইয়ে গানাবাজানা শিখনা তুম্হারা কাম নেহি। " ভীষণ বদ মেজাজী ছিলেন। পান থেকে একটু চুন খসলো কি না খসলো রেগে একেবারে যেন দুর্বাসা।

কলকাতায় থাকাকালীন কাকার কাছে আমি ততদিনে যতটাই যা গান-বাজনা শিখেছি বা কলকাতার নামকরা যে সব বাঙ্গালী গাইয়েদের শাস্ত্রীয় গায়ন এতদিন আমি শুনে এসেছি , অমন আলি খাঁ সাহেবের কাছে গান শিখতে গিয়ে দেখলাম তাঁর গান ওঁদের থেকে একেবারেই ভিন্নরঙের , ভিন্ন মেরুর। এতদিন শিখে আসা বা শুনে আসা গানের থেকে এ গান যেন সম্পূর্ণ আলাদা। সুর লাগানোর টেকনিকটাই একেবারে অন্য রকমের। কাকার কাছে শেখা ইমনের সেই বিখ্যাত বিলম্বিত খেয়াল " এরি লালন বা " যখন অমন আলি খাঁ 'র কাছে শিখতে বসলাম , দেখলাম সেটা আগের থেকে একেবারে অন্যরকম কিছু হয়ে গেছে।

গানের কথাগুলো তো সেই একই আছে , কিন্তু ফ্লেভারটা একেবারে বদলে যেত। ঐ বৃদ্ধবয়সে ও যে মাত্রার ইমন ওনার গলায় শোনার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল , সারা জীবনেও কলকাতায় কোন বাঙ্গালী হিন্দু গায়কের গলায় ওরকমটা আর শুনিনি। আসলে মুসলমান অবাঙ্গালী ওস্তাদদের সুর লাগানোর তরিকাটাই হত অন্য রকমের , যেটা বাঙ্গালীদের মধ্যে হয় না। ওদের গান শেখানোর পদ্ধতিটাও ছিল একেবারে অন্য রকমের। যেমন প্রথমেই উনি আমাকে শেখালেন সুরের মধ্য দিয়ে vowels গুলো কিভাবে শুদ্ধ করে বলতে হয়। কি করে অ বলতে হয় , কি করে আ বলতে হয়, কি করে ই বলতে হয় , কি করে ঈ বলতে হয়. এসবগুলোর ওপর ওঁরা খুব জোর দিতেন। ওঁরা এগুলোকে বলতেন 'নুম্' । আমাকে উনি প্রথম দু -তিন মাস শুধু ঐ নুমই প্র্যাকটিশ করিয়েছিলেন। উনি বলতেন ,- " দ্যাখো , বিকৃতি করে কোনদিন গান-বাজনা হয় না। গানের প্রত্যেকটা শব্দকে সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে হয়। সেই যে অনেকে গান শোনার পর বলেন, একঘন্টা ধরে গান শুনলাম , অথচ গানের একটা কথাও বুঝতে পারলাম না , আমার এখানে ওসব চলবে না। তুমি যদি গাও - " ক্যায়া কঁরু কিত যাউ .....", তখন তোমাকে এর distribution গুলো ভাবতেই হবে। তুমি যদি শব্দ গুলো ঠিক মতো না বল , অ্যা , আ , উ , ই এই বর্ণগুলোকে যদি ঠিক মতো না বলতে পারো , তাহলে সেই গান শ্রোতাদের কাছে তো দূর , তোমার নিজের কাছেই কোনদিন রসগ্রাহী হতে পারবে না। " ওঁর এই সুরের মধ্য দিয়ে স্বরবর্ণ বলানোর তালিম যে পরবর্ত্তীতে লাইট সিঙ্গিং এর সময় আমাকে কিভাবে সাহায্য করেছে গানের কথাকে যথার্থভাবে ফুটিয়ে তুলতে , সে কথা আমি কোনদিনই ভুলতে পারবো না। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে ওঁর মতো ওরকম গুনীর কাছে পুরো একবছরও আমি ঠিকমতো শিখতে পারিনি , তার আগেই উনি মারা গেলেন।

কাকার সাথে সংগীত পরিচালনার কাজ করা এবং কেউ ডাকলে ছবিতে দু-একটা প্লে-ব্যাক করে দেয়া এই সমস্ত কাজের পাশাপাশি আমি তখন বোম্বাই রেডিও থেকেও নিয়মিত ভাবেই প্রোগ্রাম - টোগ্রামও করতাম। তবে সেগুলো অবশ্যই পিওর ক্ল্যাসিকেল প্রোগ্রাম নয় , লাইট ক্লাসিকেল। যেমন ঠুংরী , দাদরা , কাজরী , গজল ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ছাড়া কখনো কখনো গীত , ভজন এগুলোও গাইতাম। অর্থাৎ এককথায় রেডিও সেন্টারে তখন আমার নিয়মিত যাতায়াত ছিল। তা একদিন হল কি , আমি যখন গান গেয়ে রেডিও স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসছি , একজন বয়স্ক মতো ভদ্রলোক এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ,- " আপ কাঁহা যা রহে হ্যাঁয় ? " বল্লাম ,-" কিঁউ ! ম্যায় আপনা ঘর যা রহা হুঁ। " উনি বল্লেন ,- " আপকা ঘর কাঁহা হ্যায় ? " আমি ঘরের ঠিকানা বল্লাম। উনি এবার বল্লেন ,- " ক্যায়া , ম্যায় অগর আপকে সাথ আউ তো কোই এ্যাহ্তরাজ তো নেহি ? " আমি বল্লাম,-"দেখিয়ে এ্যায়সি তো কোই

বাত নেঁহি , লেকিন কাঁহাতক যায়েঙ্গে আপ ? "বল্লেন, -" ম্যায় উসি তরফ হি যাউঙ্গা। " বল্লাম, - " তো আইয়ে , চলিয়ে।" তো উনি আমার সঙ্গেই গাড়ীতে এসে বসলেন।

আসতে আসতে গাড়ীতেই উনি আমাকে বলতে লাগলেন -" আমি বহুবার রেডিওতে তোমার গান শুনেছি। তোমার খুব ব্রিলিয়ান্ট ভয়েস আছে এবং আমি বুঝতে পারি যে ভালো গানবাজনার জন্য তোমার মধ্যে একটা তলাশ আছে। তুমি কলকাতার ছেলে হলেও ঐ কলকাতা মার্কা হিন্দী গান তুমি কর না। এইটে আমি লক্ষ্য করেছি এবং করে বলছি যে তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে তো আমি তোমাকে গান শেখাতে চাই।" ওঁর এইসব কথাবার্ত্তা শুনে আমি তো একেবারে অবাক। কে রে বাবা এই ভদ্রলোক ! চেনা নেই , জানা নেই ইনি হঠাৎ কেন আমাকে গান শেখাতে চাইবেন ? সোজাসুজি বলেই ফেল্লাম , - " সুনিয়ে , মেরে গানেকে বারে মে আপনে জো কুছ্ ভি কহা ,উস লিয়ে সুক্রিয়া , লেকিন বুরা না মানে তো কহু কি আপকো আভিতক্ ম্যায় প্যাহচান হি নেহি পায়া।" উনি বল্লেন ,- " হাঁ বেঁটা , হো সক্তা হ্যায় কি তুমনে মুঝে কভি দেখা হি নেঁহি , লেকিন সায়েদ তুমনে রেডিও পর সুরেশ কুমার কা গানা জরুর শুনা হোগা। ম্যায় ওহি সুরেশ কুমার হুঁ। রেডিও পর ইস নামপরহি ম্যায় লাইট মিউজিক গায়া করতা হু। লেকিন মেরা অসলি নাম আব্দুল রহমান খাঁ। " তাঁর নিজের মুখে ঐ কথা শুনে আমার তো যেন একেবারে তড়িতাহত হওয়ার মতো অবস্থা আর কি। পাতিয়ালা ঘরানার স্বনামধন্য ওস্তাদ আব্দুল রহমান খাঁ সাহেব কিনা নিজে যেচে এভাবে আমার সাথে পরিচয় করে আমাকে গান শেখাতে চাইছেন ! এযে নিজের কানে শুনেও তখনও অবিশ্বাস্য লাগছে। একটু ধাতস্থ হয়ে গিয়ে বল্লাম ,- " ওস্তাদজী , ইয়ে তো মেরে লিয়ে কুদ্ রৎ কি বাত , কি আপ য্যায়সে বুজুর্গনে খুদগর্জ হো মুঝে অপনে শার্গিদ বনানে কি বাত কহ্ রহে হ্যাঁয়। লেকিন ম্যায় এক বহুৎ হি ছোটামোটা কলাকার হুঁ , মেরে কমাই ভি ইতনা জ্যাদা কুছ নেহি হ্যায় , কি ম্যায় আপ য্যায়সা বুজুর্গ কো সহি নজরানা দে সকু। " উনি বল্লেন ,-"লেকিন ম্যায় তো তুমসে কুছ প্যায়সা নেঁহি মাঙ্গা বেঁটা। সির্ফ শিখানে কি হি বাত কহা। " এই কথার পর আমার আর কি -ই বা বলার থাকতে পারে ! রাজী হয়ে গেলাম। ঠিক হ'ল পরদিন থেকেই উনি আমাকে গান শেখাতে আমার বাড়ীতে আসবেন। তখন আমি থাকতাম , King's Circle এ। আমার ঠিকানাটা ওনাকে দিয়ে দিলাম। মনে মনে একটু শঙ্কাও ছিল যে এতবড় ওস্তাদ , উনি কি নিজে যেচে সত্যি সত্যিই এভাবে আমাকে শেখাতে আমার বাড়ীতে আসবেন ! কিন্তু না , পরদিন সকালেই উনি আমার বাড়ীতে সত্যি সত্যিই এলেন এবং আমাকে গান শেখানো শুরু করে দিলেন। ওস্তাদ আব্দুল রহমান খাঁ সাহেবের কাছে সেই আমার গান শেখার শুরু। বোধ হয় এটা ১৯৫৩ -৫৪ সনের কথা।

আব্দুল রহমান খাঁ সাহেব রোজ সকাল বেলা আমাকে গান শেখাতে

আমার বাড়ীতে আসতে লাগলেন। এদিকে আমিও ততদিনে সংগীত পরিচালনা, প্লে -ব্যাক সিঙ্গিং ইত্যাদি কাজ কর্মে খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। ব্যস্ত হয়ে উঠেছি মানে , সকালবেলায় ও গান নিয়ে বসাটাই তখন আমার পক্ষে খুবই অসুবিধে হয়ে দাঁড়ালো। একদিন ওঁকে সে কথা মুখ ফুটে বলতেই উনি বল্লেন ,- " ঠিক আছে বেটা। ওটা কোন ব্যাপারই নয়। যেদিন তোমার সকালে কাজ থাকবে, আমাকে তুমি শুধু ফোন করে একটু জানিয়ে দিও। সেদিন আমি বিকেল বেলা এসেই না হয় তোমায় শিখিয়ে যাবো। " এত বড় একজন ভারত বিখ্যাত ওস্তাদ অথচ আমার মতো একজন এত ছোটমাপের শার্গিদকে তৈরী করে দিতে তাঁর কী আত্মিক দায়বধ্যতা, কী শিশুর মতো সরল কথাবার্ত্তা। অনেক ভাগ্য করেছিলাম বলেই না ওরকম গুরু পেয়েছিলাম। আজকালকার দিনে ভাবা যায় এরকম গুরুর কথা !

কলকাতা ছেড়ে কাকার সাথে প্রথমবার বম্বে যাওয়ার কিছুদিন আগে এই কলকাতাতেই প্রথম যখন ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেবের গান শুনলাম , শুনে একেবারে যেন পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। সেকি আশ্চর্য সুন্দর গান , আহা ঃ হাঃ ! শুধু আমার মতো নবীন একজন সংগীত শিক্ষার্থীই নয় , কলকাতার তাবড় তাবড় সব গুনী গাইয়ে বাজিয়েরাও সেদিন তাঁর গান শুনে একেবারে মাতোয়ারা হয়ে গিয়েছিলেন।কলকাতায় খাঁ সাহেবেরও বোধহয় সেটা প্রথম অনুষ্ঠান ছিল এবং যতদূর মনে পড়ছে খাঁ সাহেবকে প্রথম কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন বোধ হয় ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ অথবা লালাবাবু ওরফে দামোদর দাস খান্না। এতদিন কলকাতায় যাদের গান বাজনা শুনে আসছিলাম , খাঁ সাহেবের গানের কাছে সব যেন একেবারে ফিকে হয়ে গেল। প্রথম শ্রবণেই ওদের ঐ বিশেষ ধরনের সুর লাগানোর তরীকা, তান-বিস্তারের মধ্যে ওদের ঐ মন মাতানো পাঞ্জাবী হর্‌কৎ , এসব গুলো আমাকে ভীষণ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল পাতিয়ালা ঘরানার গান বাজনার প্রতি। খুব কষ্টকর এদের টৈকনিকে গান-বাজনা করা। সেই পাতিয়ালা ঘরানার ওস্তাদ আব্দুল রহমান খাঁ সাহেবকে এভাবে অপ্রত্যাশিত ভাবে গুরু হিসেবে পেয়ে এককথায় আমি ধন্য হয়ে গেছি। কিন্তু বম্বেতে দশ- বারো বছর থেকে ততদিনে আমি তো পুরোপুরি লাইট মিউজিকের দিকেই ঝুঁকে গিয়েছিলাম , তাই বেশ কিছুদিন শেখার পর পাতিয়ালা ঢঙে সুর লাগানোর তরীকটা যখন কিছুটা আয়ত্ব করে ফেল্লাম , ওদের ঐ পাঞ্জাবী হর্‌কৎগুলো যখন সহজ ভাবেই গলায় আসতে লাগলো , ততদিনে ওঁর শেখানোটা আমার কাছে ক্রমেই কেমন যেন ভারী ভারী মনে হতে লাগলো। প্রতিদিন পোলাও-মাংস খাওয়ার মতো কেমন যেন একটা একঘেঁয়েমি এসে গেল। বড় খেয়ালের এত ঘি-গরম মশলা আর যেন ঠিক ডাইজেষ্ট করতে পারছিলাম না কোনমতেই। ওঁকে সেকথা মুখফুটে একদিন বলতেই উনি বললেন ,- " আমি এই দিনটির জন্যই বহুদিন ধরে অপেক্ষা করেছিলাম। প্রথম থেকেই এই ব্যাপারটার দিকে

আমি লক্ষ্য রেখে চলেছি যে , যেদিন আমি বুঝতে পারবো যে তোমার গলাটা লাইট সিঙ্গিং এর জন্য তৈরী হয়ে গেছে,সেদিন থেকেই তোমাকে আমি লাইট ক্লাসিকেল গান শেখাতে আরম্ভ করবো। আজ উও দিন আ গয়া। আজসে তুম্হারা বড়া খেয়াল শিখনা বন্ধ। আজসে সির্ফ লাইট ক্লাসিকেল গানাহি হোগা, বাকী সব বন্ধ্। " শুরু হল তাঁর কাছে লাইট ক্লাসিকেল শেখা।

পাতিয়ালা ঘরানার ঠুংরী , দাদরা , কাজরী নিয়ে নতুন করে আর কিছু বলার নেই। নিজের আলোতেই সে আলোকিত। লাইট ক্ল্যাসিকেলের ক্ষেত্রে পাতিয়ালা ঘরানার ওস্তাদরা এতটাই এগিয়ে গিয়েছিলেন যে অনেকের মতে এরা যখন খেয়াল গাইতেন তখন নাকি খেয়ালের মধ্যেও ঠুংরীর রঙ্ লেগে যেত। যাই হোক , খেয়ালের পাট চুকিয়ে সেদিন থেকেই আমি লাইট ক্ল্যাসিকেল শিখতে লাগলাম। প্রথমেই উনি আমাকে শেখালেন একটা ঠুংরী ,-" মোরে বুধ্ লড়কইয়া ,ম্যায় কা জানু রাম ! " - আমার বুদ্ধি একেবারেই ছেলেমানুষের মতো , আমি এখন কি করব, না করব কিছুই বুঝতে পারছি না। কিছুই আমার মাথায় আসছে না। কৈশোরোত্তীর্ণা কোন সদ্য যুবতীর কোন এক বিশেষ মুহূর্তে এই যে ভাব , এই যে অভিব্যক্তি , তাকে কত রকম ভাবে সুরের মধ্য দিয়ে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় , কিভাবে বললে পর সেই ভাবটি যথার্থভাবে মূর্ত্ত করে তোলা যায় , এই ব্যাপারগুলোই উনি আমাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এই যে তালিম অর্থাৎ কোন কথাকে তাঁর ভাবানুযায়ী সুরের মধ্য দিয়ে যথার্থভাবে ফুটিয়ে তোলার এই যে তালিম , পরবর্ত্তীকালে গান গাওয়ার ক্ষেত্রে বা সুর করার ক্ষেত্রে সেই তালিম যে কিভাবে আমাকে ধ্রুবতারার মতো বারবার পথ দেখিয়েছে , সে আমি বলে বোঝাতে পারবো না।

আব্দুল রহমান খাঁ সাহেবের পর আমি গান শিখেছিলাম ওস্তাদ গোলাম মুস্তাফা খাঁ সাহেবের কাছে। এঁর গানের মধ্যে আবার একেবারে অন্য রকমের ফ্লেভার। উনি প্রথমে আমাকে শেখালেন রাগ মূলতানী ,- " গোকুল গাঁও .....।" এই রাগটা প্রথম আমি কাকার কাছেই শিখেছিলাম এবং কলকাতাতে বহু গুনীর কন্ঠেই এই বন্দেজ আমি বহুবার শুনেছিলাম কিন্তু গোলাম মুস্তাফা খাঁ যখন " এ এ এ গোকুল গাঁও " বলে মুখ্ড়াটা ধরতেন , মনে হ'ত পুরো মূলতানীটাই যেন এক লহমায় চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠত । আমীর খাঁ সাহেবের মারোয়া যেমন আজ কিংবদন্তীতে পরিণত , তেমনি গোলাম মুস্তাফা খাঁ সাহেবের গলায় মূলতানী শোনাও আমার জীবনে এক বিরলতম অভিজ্ঞতা।উনি যখন সুর লাগাতেন ,- নিসাম'গম' প -,ম' পগম' গরেসা -, তখন তার যে কি সুরভি, তার যে কি মজা না , সেটা খাঁ সাহেবের মূলতানী যে না শুনেছে , সে কখনো কল্পনাই করতে পারবে না। এর পর বিলম্বিতটা শেষ করেই উনি যেভাবে একটা মোচড় দিয়ে ধরে দিতেন সেই বিখ্যাত দ্রুত বন্দেজ -

" লঙর মোহে ছা , দে দে বনয়ারী .... " তখন মনে হত মূলতান যেন তৈরীই হয়েছিল একমাত্র তাঁর জন্যই। এরপর যেন সব রাগই ফিকে।এটা প্রায় প্রত্যেক মুসলমান ওস্তাদের মধ্যেই দেখেছি যে হিন্দু পন্ডিতরা যত যা-ই গেয়ে যাক, যতই সুর লাগিয়ে যাক না কেন , কোন একজন মুসলমান ওস্তাদ এসে সুর লাগালেই আগের সব সুর যেন এক নিমেষে ধুয়ে মুছে উধাও হয়ে যেত। ওদের সুর লাগানোর টেকনিকটাই একেবারে অন্যরকমের হ'ত। যেটা কোন হিন্দু পন্ডিতের গানেই খুঁজে পাওয়া যেত না। আসলে মুসলমান ওস্তাদদের সাথে গান বাজনার সম্পর্কটাই হত অন্যরকমের। পড়াশোনা করা , হাট -বাজার করা ইত্যাদি কোন কাজেই ওদেরকে করতে হ'ত না।জন্মানোর পর থেকেই ঐ গানবাজনা নিয়েই সারাদিন পড়ে থাকতো। টোড়ী দিয়ে দিনের শুরু হল , তো ঘুমোতে যেত দরবারী কানাড়ার শেষ তেহাইটা দিয়ে। তাছাড়া বাবা , কাকা, মামা, পিসে তিনকুলের সবাই হতেন এক একজন নাম করা গাইয়ে বাজিয়ে। এই যে dedication , এই যে involvement , হিন্দুদের মধ্যে এটা প্রায় হত না বল্লেই চলে। যে কারণেই কোন একজন হিন্দু পন্ডিত যখন একেকটা স্বর লাগিয়ে লাগিয়ে বেশ কিছুটা সময় আলাপ করার পর ধীরে ধীরে রাগ - রূপটা ফুটে উঠত , তখন একজন মুসলমান ওস্তাদ প্রথম সুরটা লাগালেই বুঝতে পারা যেত যে এটা এই রাগ। বহুদিন আগে সুরেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও তাঁর 'সুধা সাগর তীরে ' বইতে পন্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর এবং ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ সাহেবের মালকোঁষের সুর লাগানোর কথা বলতে গিয়ে এই বেসিক পার্থক্যটিকে খুব স্পষ্টভাবেই তুলে ধরেছিলেন।

শাস্ত্রীয় সংগীতের সাথে সাথে আমার যোগাযোগটা একেবারে আমার সেই ছেলেবেলা থেকে। আমি নিজে যখন গান-বাজনা শুরু করার পর্যায়েই পৌঁছুইনি তারও বহু আগে থেকেই রাগ রাগিনীর রস আমার রক্তে মিশে গিয়েছিল। কাকাকে কেন্দ্র করে আমাদের বাড়ীতে আসা ওস্তাদজীদের গান-বাজনাতো নিয়মিত শুনতামই ,এছাড়া সংগীতগত প্রাণ বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত বাড়ীতে আয়োজিত মেহ্‌ফিল থেকে শুরু করে মায় একেবারে সঙ্গীত সম্মেলন পর্যন্ত সর্ব্বত্রই তখন কাকার হাত ধরে আমার নিয়মিত যাতায়াত ছিল। কনফারেন্সের আগের যুগে এই কলকাতা শহরে তখন শঙ্কর উৎসব, লালচাঁদ বড়াল উৎসব , মুরারী উৎসব ইত্যাদি অনেকগুলো বিখ্যাত বাৎসরিক ঘরোয়া সংগীতাসর হ'ত। কাকার তল্পিবাহক হিসেবে এই সব আসরের প্রায় সবকয়টিতেই আমার বহুবার যাবার সুযোগ হয়েছিল এবং বাইরে থেকে আসা বহু ওস্তাদকেও তখন এই সব আসরে একেবারেই সামনে বসে শুনেছি। আব্দুল করিম খাঁ সাহেব কেও এই কলকাতাতেই আমি শুনেছি। শুনেছি হাফেজ আলি খাঁ,আলাউদ্দিন খাঁ , থেকে শুরু করে তাদের পরবর্ত্তী প্রজন্মের আমজাদ আলি খাঁ , নিখিল ব্যানার্জী , বিলায়ত খাঁ , রবিশঙ্কর প্রমুখ প্রায় প্রত্যেক গুণী শিল্পীকেই। সুদীর্ঘ বছর ধরে এত এত গুণী ওস্তাদদের গান- বাজনা শুনে শুনে এবং

কৃষ্ণচন্দ্র দে, দবীর খাঁ , অমন আলি খাঁ , আব্দুল রহমান খাঁ , গোলাম মুস্তাফা খাঁ, জগন্নাথ বুয়া , তুলসী দাস শর্মা প্রমুখ ওস্তাদ তথা পন্ডিতদের কাছে বছরের পর বছর ধরে সংগীত শিক্ষা করে করে শাস্ত্রীয় সংগীত সম্পর্কে আমার যে সামান্য অভিজ্ঞতা হয়েছে , সে সম্পর্কে কিছু কথা অন্তত এখানে বলে নেওয়া উচিত। শাস্ত্রীয় সংগীতের একজন authority হয়তো মোটেও নই , হয়তো শাস্ত্রীয় সংগীত নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করার স্বীকৃত অধিকারী ও আমি নই। তবু ঠিক - বেঠিক যা-ইহোক অভিজ্ঞতা লব্ধ ধারণাকে তুলে ধরাই বোধহয় সমীচিন। তাতে বিতর্ক এলেও নতুন করে যাচাই করে নেয়ার একটা সুযোগও হয়তো পাশাপাশি এসে যাবে।

বম্বেতে গিয়ে আমি যখন ওস্তাদদের কাছে গান শিখতে শুরু করেছিলাম তখন ওঁরা প্রায় সব সময় আমাকে একটা কথা বলতেন যে, - "তোমার এত ভালো তালিম আছে , শাস্ত্রীয় সংগীতের উপযুক্ত এত সুন্দর গলা আছে , গান শেখার নেক আছে ,তুমি কেন পড়ে আছো চটুল ঐ ফিল্মী গানের জগতে ! কেন পুরোপুরি শাস্ত্রীয় সংগীতের লাইনেই চলে আসছো না ! "হ্যাঁ এটা হয়তো সত্যিই একটা ভাববার মতো ব্যাপার যে এত কিছুর পরও কেন আমি শেষপর্যন্ত মার্গ সংগীত শিল্পী হইনি বা হতে পারিনি। এককথায় এর জবাব -"আমি তেমনটাই হতে চাইনি , তাই হতে পারিনি।"এই না চাওয়ার পেছনে আমার নিজস্ব কিছু লজিক অবশ্যই ছিল এবং সেই লজিক আমার শাস্ত্রীয় সংগীতে লব্ধ অভিজ্ঞতারই ফলশ্রুতি। প্রথমত , যে বয়সে আমি সত্যিকারের গান-বাজনার রেয়াজ শুরু করেছিলাম , দেখলাম সেই বয়সটা একজন প্রফেশনাল ক্লাসিকেল সিঙ্গার হওয়ার জন্য বড্ড দেরী হয়ে গেছে । হয়তো ঐ বয়সে শুরু করলেও সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে শুধু শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা করলে একজন সাধারণ মাপের খেয়ালিয়া আমি হতে পারতাম , কিন্তু যাঁদের গান-বাজনা শুনে ওভাবে ক্লাসিকেল মিউজিকের জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলাম , তাদের সমকক্ষতা তো বহু দূর , ধারকাছ দিয়েও ঘেঁসতে পারতাম না কোনদিন , সেই রকম গান-বাজনা দিয়ে না তো শাস্ত্রীয় সংগীতের কোন লাভ হত, নাতো আমার নিজের কোন রিকগনিশন হ'ত। এছাড়া এখন শাস্ত্রীয় সংগীতের অবস্থাটা অনেক পাল্টে গেলেও আমি যখন গান-বাজনা শুরু করেছিলাম , তখন দেখতাম যে 'ওস্তাদ' 'পন্ডিত' এসব গুলো শুনতে খুব গালভরা শোনালেও প্র্যাকটিকেলি ক্লাসিকেল মিউজিক বা মিউজিশিয়ানদের সেই অর্থে তেমন কোন কদরই হ'ত না। গোনাগুনতি ঐ দু-একজন টপ র‍্যাঙ্কিং ওস্তাদ ছাড়া অন্যদের তখন নুন আনতে পান্তা ফুরানোর মতো অবস্থা হয়। ভালো করে খাওয়া পর্যন্ত জুটতো না। ওরা দুঃখ করে বলতেন ,-"কৌন সুনেগা !কৌন শুনতা হ্যায় ভাই হামলোগকো ! " ওস্তাদদেরই যখন এই অবস্থা , তখন আমার মতো একজন সাধারণ মাপের খেয়ালীয়ার কি করুন পরিনতি হতে পারে , এই

ভেবে , ভেবেই খায়ালিয়া হওয়ার স্বপ্নটা আমার মাথা থেকে বেমালুম উবে গিয়েছিল। আমার ধারণা আমার কাকাও হয়তো শাস্ত্রীয় সংগীত নিয়ে এতকিছু করার পরও এই কারণেই শেষ পর্যন্ত ওসব ছেঁড়ে ছুঁড়ে লাইট মিউজিকের দিকে চলে এসেছিলেন।

দিকপাল সব ওস্তাদদের কাছে বছরের পর বছর এত কষ্ট করে শাস্ত্রীয় সংগীত শিখেও শেষ পর্যন্ত শাস্ত্রীয় গায়ক না হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, আমাদের শাস্ত্রীয় সংগীতের এমন কিছু কিছু জিনিস আছে , যেটা আমি একদম বরদাস্ত করতে পারতাম না। এখনও পারিনা। যেমন আমাদের রাগ পরিবেশনের যে পদ্ধতি অর্থাৎ the way of exposition of a raga সেইটি আমার প্রথম থেকেই অসহ্য লাগতো। এই যেমন ধরা যাক কোন ওস্তাদ হয়তো ইমন গাইতে এলেন। প্রথমে উনি নোম- তোম , নোম-তোম করে কতক্ষন ইমনের আলাপ করলেন, তারপর একঘন্টা ধরে বিলম্বিত গাইলেন ,-ঐ ইমন। তারপর পনের -কুড়ি মিনিট ধরে দ্রুত গাইলেন ,- ঐ ইমনই । তারপর আবার তারানা গাইলেন আট- দশ মিনিট ,- ঐ ইমনই। বাপরে ! পাগল হবার জোগাড় আরকি ! আমারতো একেবারে অসহ্য লাগতো তিন ঘন্টা ধরে ঐ একই রাগের কম্পোজিশন শুনতে শুনতে।মনে মনে ভাবতাম , যে গাইছে, সে নিজে বোর হয়না এরকম রিপিটেটিভ কম্পোজিশন গেয়ে গেয়ে । তা-ও আবার রিপিটেশন কি এই সেই রিপিটেশন ! ওস্তাদ হয়তো গাইলেন ,- নি রে ssssss গা, রে sssss গা ssssssss , নিরেssssss, রে sss, ধাসা sss । তাঁর গাওয়া শেষ হতেই প্রথমে সারেঙ্গী ওয়ালা ঐ একই কম্বিনেশন তাঁর সারেঙ্গীতে বাজালেন,- ট্যা ট্যা sssssssট, ট্যা sssss ট্যা ssssss ট্যা sss ট্যাট্যা। সারেঙ্গীওয়ালা থামতেই এবার হারমোনিয়ামওয়ালা ও প্যা প্যা করে তাঁর হারমোনিয়মে বাজাতে লাগলেন ঐ একই সুর। ওস্তাদজী গাইলেন, - ধানি sss , মা'ধা নি, নিমা'ধাম'নি ,গামা'ধানি ............। আবার সারেঙ্গী - হারমোনিয়মে ট্যা ট্যা - প্যা প্যা করে ঐ একই সুরের পুনারাবৃত্তি। এই করে করে ওস্তাদ হয়তো দশ মিনিটে পঞ্চম এবং পনেরো মিনিটে মাত্র নিষাদে গিয়েই পৌঁছলেন। নিষাদে পৌঁছে শুরু হ'ল আর এক খেল। নিষাদে গিয়েই পৌঁছলেন। নিষাদে পৌঁছে শুরু হ'ল আর এক খেল। নিষাদ অর্থাৎ ' নি ' কে কেন্দ্র করে যতরকম কেরামতি সম্ভব মা'ধনি , ধানি, মা'গামা'ধানি , গা'মাধা'মাধানি......... ......সব দেখাতে লাগলেন এবং সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মনে হত উনি যেন বলতে চাইছেন যে দ্যাখো , আমি কত বড় ওস্তাদ। একেকটা স্বরকে টেনে হিঁচড়ে কি করে ফেলছি , অথচ ছিঁড়ছে না।এই করে শ্রোতাদেরকে একটানা বিরক্তিকর উদ্বেগের মধ্যে রখে শেষপর্যন্ত উনি যখন তারার ষড়জে গিয়ে দাঁড়ালেন ,সবাই যেন একটা রিলিফ পেলেন।গান বাজনায় এই রিলিফটা খুবই দরকার। এবং সেই সঙ্গে দরকার একটা সুপরিকল্পিত সীমিত বোধ। কিন্তু ঐ যে কসরৎ ঐ যে একটা রাগের যত যা কিছু শিখেছি

সব একসাথে দেখাতে গিয়ে রাগটাকে টেনে হিঁচড়ে যেভাবেই হোক দু-আড়াই ঘন্টা ধরে গাওয়ার এক ধরণের নাকখৎ দেখার প্রাণান্তকর প্রয়াস , ঐটে আমার একেবারেই পছন্দ হত না। যেকারণেই একমাত্র হাফেজ আলি খাঁ , বড়ে গোলাম আলি খাঁ প্রমুখ এরকম দু-একজন ওস্তাদ ছাড়া বাদবাকী প্রায় সবার গান- বাজনাই সেই অর্থে আমার কাছে বিরক্তিকর লাগতো। হয়তো আমাদের রাগ-রাগিণী গাওয়ার ব্যকরণগত পদ্ধতিটাই সেরকম এবং যারা খুব রিজিডলি কোন রাগ-রাগিণী শুনতে ভালোবাসেন , যাদের ঐরকম মনের অবস্থা আছে , তাদের কাছে ঐগুলো শুনতে নিশ্চয়ই ভালো লাগে , তা না হলে এত এত লোক সে গান শুনছে কেন। এটা একটা mental make up এর ব্যাপার and that may vary from man to man . কিন্তু আমার নিজের বারবারই মনে হয়েছে যে এগুলো নিতান্তই একটা সুপারফ্লুয়াস জিনিস and the'ustads' used to impose all these superfluous glorious feats on the listener , intentionally ignoring the listeners' own taste in music . মানে বেশীর ভাগ ওস্তাদরাই ভাবতেন যে ওঁরা নিজেরা যেভাবে তাঁদের গুরুর কাছে গান- বাজনা শিখেছেন, সেই ভাবেই তাঁরা গাইবেন ,একচুলও এদিক ওদিক হবেনা। এবং লোককে জোর জবরদস্তি করে হলেও সে গান ভালো লাগাতেই হবে । কারণ তাঁরা যে ওস্তাদ ! খেয়াল গায়নের এই অহেতুক ওস্তাদি গুলোই আমি কোনদিনই বরদাস্ত করতে পারতাম না। আমাকে যদি সত্যি সত্যিই সেদিন খেয়ালিয়া হতে হতো , তবে ঐ প্রথাবাহী ক্লান্তিকর পদ্ধতির বাইরে এসে অবশ্যই ততটাই অন্যরকম কিছু গাইতাম , যতটা গাইলে রাগের রূপটাও প্রকাশ পায় অথচ শ্রোতারা বিরক্ত হওয়ার আগেই সসম্মানে শেষ তেহাইটা দিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু তখনকার দিনে ঐভাবে সত্যি সত্যিই গাইলে কেউ আমাকে স্বীকৃতিই দিতনা, শুনতই না আমার সেই প্রথাভাঙ্গা গান। তবে হ্যাঁ, আজকাল এই two minutes noodles এর যুগে শাস্ত্রীয় সংগীতেও যেরকম পরিবর্ত্তন এসেছে , যেভাবে আজকাল শুধু রাগের highlights গুলো গেয়ে দশ-পনের মিনিটের মধ্যে একটা পুরো রাগ পরিবেশন করা হয় , সেদিন যদি ওস্তাদ মহলে এই গায়নরীতি প্রচলিত থাকতো , কি জানি , হয়তো তাহলে প্লে-ব্যাক সিঙ্গিংএ আমার আর কোনদিনই আসা হতনা।

শাস্ত্রীয় সংগীত বিশেষত খেয়াল গানের যে সমস্ত জিনিষ আমি বরদাস্ত করতে পারতাম না তার অন্যতম আর একটি ব্যাপার হ'ল খেয়ালের বাণী অর্থাৎ কথা। আমার তো মনে হয় য়ে , যারা নিয়মিত ক্লাসিকেল মিউজিক শোনেন , তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকেই কখনো ভাবেন না যে কোন্ রাগের ওপর কি কথা বসানো হয়েছে এবং সেই রাগে সেই কথাটা interpret হচ্ছে কিনা। খেয়ালে ভালো ভালো বন্দেজ নিশ্চয় আছে কিন্তু বেশীরভাগ বন্দেজেই এমন সব আবোল-তাবোল কথা থাকে

যে কথার না তো কোন সাহিত্যিক মূল্য থাকে , না তো সেই রাগের সাথে আদৌ মানানসই হয়। আসলে হ'তকি আগের দিনে যারা এই সব খেয়াল গান রচনা করতেন , সরস্বতীর বরপুত্র সেই সব ওস্তাদরা সরস্বতী একটি দিক অর্থাৎ সুরের দিকটায় উৎকর্ষতার একেবারে চরমসীমায় পৌঁছে গেলেও সরস্বতীর অন্য দিকটা অর্থাৎ পড়াশোনার দিকটায় থেকে যেতেন একেবারে সভ্যতার আদি পর্যায়ে । শুনতে খারাপ লাগলেও এটা খুবই সত্য যে যাদের গান- বাজনা শুনে মানুষ একেবারে পাগল হয়ে যেত , তাদের অনেককেই দেখেছি যে তারা নিজের নামটা পর্যন্ত লিখতে পারতেন না , টিপসই দিতেন। এই রকম ওস্তাদরা যখন বন্দেজ রচনা করতেন , সে বন্দেজের যে কি হাল হত বোধহয় বলবার আর অপেক্ষাই রাখেনা । ভালো ভালো বন্দেজের কথাও এদের সুরের টানা-হ্যাঁচড়ায় এমন একটা বিদঘুটে অবস্থায় পৌঁছে যেত যে, বন্দেজের কোন কথাই বেশীরভাগ সময় শ্রোতাদের বোধগম্য হ'ত না। এসব ব্যাপার নিয়ে ওস্তাদদের সাথে সব সময় আমি লড়ে গেছি যে, কেন এমনটা হবে ! আবার আমার ওস্তাদের কাছেই বিলম্বিত খেয়ালের এমন বন্দেজ শুনেছি যে নিজের অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে -" বাঃ কি সুন্দর কথা , কি সুন্দর exposition।" যেমন একটা গান ছিল -" কাসে কহু দুঃখ কে বঁতিয়া ....."- আমার দুঃখের কথা কাকে বলব , কে আছে আমার আপনজন। ওস্তাদজী যখন বাড়ত বিস্তারের মধ্য দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গানের এই কথা গুলোকে বলতেন , সেই বিলম্বিত গান শুনে তখন চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত । ভাবতাম- আহাঃ বিলম্বিত খেয়ালও এত সুন্দর হতে পারে ! আসলে আমাদের শাস্ত্রীয় সংগীত পৃথিবীর যেকোন দেশের শাস্ত্রীয় সংগীতের চেয়েই অনেক rich কিন্তু ওস্তাদদের ঐ গোঁড়ামী , ঐ ভালো লাগানোর মতো চিন্তা ভাবনার অভাবের জন্যই এই গান ক্রমশই মানুষের থেকে আজ দূরে সরে গেছে। আমি এখনো বিশ্বাস করি যে আলট্রা যুব সমাজ আমাদের সংগীত থেকে মুখ ঘুরিয়ে আজ অন্য পথে চলেছে , তাদেরকে যদি " ঝনন ঝনন ঝনন বাজে বিছুয়া , পিয়া ..... " গোছের শাস্ত্রীয় গান সহি লয়ে , সহি ছন্দে , সহি সুরে শুনিয়ে দেয়া যায়, শাস্ত্রীয় সংগীতের কিছু না জেনেও তারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বাধ্য হবে ঠায় দাঁড়িয়ে সেই গান শুনতে।

এত কিছুর পরও বছরের পর বছর ধরে বহু কষ্টকরে বিভিন্ন ঘরানার শাস্ত্রীয় গান আমি শিখেছি। কিন্তু সেই শেখাটা একজন খেয়ালীয়া হওয়ার অভিপ্রায়ে নয় , গলাটাকে ইচ্ছে মতো সুরের মধ্য দিয়ে খেলতে পারার মতো যোগ্যতা অর্জনের তাগিদে , সুরের হরকৎ গুলোকে ঠিকমতো আয়ত্ব করার তাগিদে। এবং সেই দিয়ে আমার লাইট সিঙ্গিংকে আরও ফলপ্রসূ করে তুলতে , আরও অর্থবহ করে তুলতে। প্র্যাকটিকেলি সারাজীবনে আমি যতটুকু যা করেছি , সমস্তই আমার ঐ শাস্ত্রীয় সংগীতের সমস্ত হরকৎ , সমস্ত কার্‌চোব্‌ , সমস্ত ফান্দা - সিলসিলা

incorporate করেই গড়ে উঠেছে আমার লাইট মিউজিকের এই ক্ষুদ্র জগৎ । ক্ল্যাসিকেল মিউজিকের ঐ ভিত্ না থাকলে আমার এই গায়ক সত্ত্বার আজ কোন অস্তিত্বই থাকতো না । যে সমস্ত গানের জন্য আমি আমার শ্রোতাদের এত কাছাকাছি চলে এসেছি , সেই -" পুছনা ক্যায়সে ম্যায়নে রৈন বিতায়ি," "গোরী তোরি প্যায়জনিয়া " "দীপ ছিল শিখা ছিল " থেকে শুরু করে একেবারে হাল আমলের " কে গো নাগরী " "আমি আজীবন শুধু ভুল করে গেছি " পর্যন্ত সমস্ত গানেই আমার শেখা শাস্ত্রীয় রাগ রাগিণীরাই বার বার উঁকি দিয়ে গেছে । আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে, শাস্ত্রীয় সংগীতের নাম শুনলেই যে লোক আসর থেকে দশহাত দুরে পালিয়ে যায় , উদগ্রীব হয়ে " এহি বাফা কা সিলা হ্যায় তো কোই বাত নেহি " শুনে সেই লোকেই বলে - বাঃ ইমন রাগটাতো খুব সুন্দর ," "পুছনা ক্যায়সে ম্যায়নে " শুনে সেই লোকেই বলে - " বা ঃ আহীর ভৈরব রাগটাতো খুব touchy ", এই খানেই বোধহয় আমার শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষার সার্থকতা । যে ধারার গান বাজনাই করিনা কেন, গলাটাকে ঠিকমতো তৈরী করতে মার্গ সংগীত শেখাটা সকলের পক্ষেই একান্ত জরুরী । এবং সেজন্য চাই উপযুক্ত গুরু । উপযুক্ত গুরু ছাড়া সঠিক পথ খুঁজে পাওয়া এককথায় অসম্ভব । রফি আমাকে প্রায়ই বলত যে -" দাদা আপ উপরমে ভি ক্যায়সে ইতনা খোলকে গাতে হ্যায় ?" অথচ আমার মনে আছে , আমি যখন প্লে- ব্যাক সিঙ্গিংয়ে মোটামুটি এসে গেছি , তখন গান গাইতে গিয়ে দেখতাম নীচের দিকে গলাটা যতটা খুলে গাইতে পারতাম , ওপরের দিকে গেলেই গলাটা কেমন যেন চেপে যেত । খুবই অসুবিধে হ'ত গান গাইতে । একদিন গোলাম মুস্তাফা খাঁকে সেকথা বলতেই উনি বল্লেন ,আরে ওটা কোন ব্যাপারই নয় । আপনি যে স্কেলে গান করেন তার পঞ্চমকে ষড়জ বানিয়ে কিছুদিন সরগম প্র্যাক্টিশ করুন, দেখবেন গলা আপনে আপ ওপরের দিকেও খুলে যাবে । আমি তো বরাবরই ডি-শার্প থেকে রেয়াজ করি । ওনার কথামতো পঞ্চমকে ষড়জ বানিয়ে মাস খানেক রেয়াজ করতেই আমার গলা এত খুলে গেল যে, সারাজীবনেও স্কেল দিয়ে কোন পরিচালকই আমাকে আর বাঁধতে পারেনি কোনদিন ।